সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

নিরাপত্তার অজুহাতে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ ছিলো

গত ১৮ নভেম্বর সরকারি নির্দেশে ফেসবুক, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, ট্যাঙ্গোসহ বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেটভিত্তিক ১০টি যোগাযোগ মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে সোয়া এক ঘণ্টা ইন্টারনেট সেবাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য প্রতি সার্ভার দিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যেই এগুলো ব্যবহার শুরু করে দেন অনেকে। এমনকি মন্ত্রী, এমপি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশ কয়েকটি সংস্থা বিকল্প উপায়ে তাদের নিজ নিজ ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং পেইজে নিয়মিতভাবে ছবিসহ আপডেট দিয়েছেন। এরই মাঝে তথ্য আদান-প্রদানে সহযোগিতার জন্য চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে ৩০ নভেম্বর ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ ডিসেম্বর ফেসবুকের দুজন প্রতিনিধির সাথে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে ফেসবুকের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে ফলপ্রসূ আলোচনা বলে প্রচার চালানো হয়। অবশ্য ২০১৩ সালে ফেসবুক 'গ্লোবাল গভর্নমেন্ট রিকোয়েস্টস' চালুর পর থেকে বাংলাদেশ সরকার ৩৭ জন ব্যবহারকারী সম্পর্কে তথ্য চেয়ে ১৬টি অনুরোধ করলেও এর একটিতেও সাড়া দেয়নি ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ১০ ডিসেম্বর ফেসবুক খুলে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়, যদিও সরকার অন্য অ্যাপসগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যোগাযোগ মাধ্যমগুলো পুনরায় খুলে দেওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় 'জরুরি পরিস্থিতি' তৈরি না হলে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর বন্ধ করা হবে না বলে জানান ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। এরপর ১৩ ডিসেম্বর নতুন করে বন্ধ করে দেওয়া হয় টুইটার, স্কাইপ ও ইমো; যদিও এগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা ছিল না বলে সাংবাদিকদের জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। অবশ্য এক দিন পরই পুনরায় খুলে দেওয়া হয় সব অ্যাপ।

এর আগে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। তবে ১০ ডিসেম্বর ফেসবুক পুনরায় খুলে দেওয়ার ঘোষণা আসার দিনেই ফেসবুকের ফান পেইজ 'মজা লস'-এর অ্যাডমিন রিফায়েত আহম্মেদকে গ্রেপ্তার করে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। তাই টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে চলে আসা সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোই যখন স্বাধীন মত প্রকাশের একমাত্র সহায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিল, তখন নিরাপত্তা প্রদানের অজুহাতে ফেসবুক, ভাইবারের মতো জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেওয়াকে সরকারের বিরুদ্ধ মত দমনের চরমতম বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই মনে করছেন অনেকে। ❑

ননএমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলন

দেশে এখন সাত হাজার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ননএমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এক লাখ পাঁচ হাজার শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ দিয়ে কোনোমতে বেতন-ভাতা হয় এসব স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের। বিশেষ করে মফস্বল এলাকার শিক্ষার্থীদের স্কুল ফি কম হওয়ায় সেখানকার শিক্ষকরা নামে মাত্র বেতন নিচ্ছেন অথবা নিচ্ছেনই না। নিদারুণ অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে চলছে এসব শিক্ষকের সংসার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এমপিওভুক্ত হতে হলে সরকারি স্বীকৃতি থাকা লাগে। এই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোনো সরকারি আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। এসব শর্তের মধ্যে পড়ে : ভৌগোলিক দূরত্ব ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার শর্ত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেজিস্টার্ড হওয়ার শর্ত, সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকার শর্ত, পাবলিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ফলাফল অর্জন ইত্যাদি। অন্যান্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নির্বাচন থেকে শুরু করে যেসব সরকারি দায়িত্ব পালন করেন, তার সবকিছুই এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পালন করতে হয়। অথচ স্বীকৃতি থাকার পরও, এসব সরকারি কাজে অংশ নিতে বাধ্য হওয়ার পরও এই শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কোনো বেতন পাননি। এত কিছুর পরও এসব শিক্ষক নিজ নিজ উদ্যোগে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহায়তার মধ্য দিয়ে স্কুল চালিয়ে নিয়েছেন। এইসব অক্লান্ত পরিশ্রমী শিক্ষক কেউ কেউ নিজ সংসার চালানোর জন্য ক্লাসের পর অটোরিকশা চালান, কেউ কেউ চাষবাস কিংবা উপার্জনের অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এমনকি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা ক্লাসের পর দিনমজুরের কাজ পর্যন্ত করেছেন। দিনের পর দিন বেতন না পেয়ে, আর্থিক সংকটের কারণে শিক্ষকসুলভ জীবনমান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রতিনিয়ত হেয় হতে হয় এমন শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক। সব মিলিয়ে রীতিমতো দুর্বিষহ এক অবস্থায় এই শিক্ষকদের দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে এমপিওভুক্তির জন্য ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন ননএমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। পরে ২৮ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনে চালিয়ে গেছেন লাগাতার এই আন্দোলন। ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকরা অনশন কর্মসূচি চালান। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের উপস্থিতিতে এবং তাঁদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনশন ভঙ্গ করেছিলেন শিক্ষকরা। নানা উপায়ে আন্দোলন চলাকালে এই নিরুপায় শিক্ষকরা তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। কখনো মুখে কালো কাপড় বেঁধে, কখনো শূন্য থালা হাতে, কখনো মোমবাতি নিয়ে, কখনো বা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে। এমনকি আন্দোলনের ২২তম দিন থেকে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে কর্মসূচি পালন করেছেন। আন্দোলনের ৩২তম দিনে এমপিওভুক্তির 'আশ্বাসে' আন্দোলন স্থগিত করেন শিক্ষকরা। ২২ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট নামের একটি দল থেকে নির্বাচিত এমপি আবুল কালাম আজাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আশ্বাস' নিয়ে উপস্থিত হন। এই 'আশ্বাসের' প্রেক্ষিতে ননএমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ এশারত আলী আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দেন। তবে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অনেকের মতে, আজাদ কেউ নন প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস পৌঁছে দেওয়ার। তাঁর কথায় আন্দোলন স্থগিত করা ঠিক হবে না। সংবাদপত্রগুলো মারফত জানা যায়, আজাদের বিরুদ্ধে গুলশান মডেল স্কুল ও কলেজ থেকে চিকিৎসা বাবদ ৩০ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তদন্ত করেছে শিক্ষা অধিদপ্তর। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কিছু টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। অনেক শিক্ষকই তাই এমপি আজাদের কথায় আন্দোলন স্থগিত করাকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছেন। ❑

সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় কনভেনশন
১০ থেকে ১৫ মার্চ '১৬ সুন্দরবন অভিমূখে লংমার্চ

১৪ নভেম্বর ২০১৫ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় কনভেনশন। কনভেনশন থেকে সুন্দরবনকে 'মহাপ্রাণ' আখ্যায়িত করে একে বাঁচাতে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবিদ, রাজনীতিক সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিরা। কনভেনশন থেকে 'রামপাল ও ওরিয়ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল এবং বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জাতীয় কমিটির ৭ দফা বাস্তবায়নে ৪ মাসের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, সারাদেশে সফর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি '১৬ তে ঢাকা মহানগর সহ বিভাগীয় শহরে পদযাত্রা, সংহতি সমাবেশ এবং দাবি না মানলে ১০ থেকে ১৫ মার্চ '১৬ সুন্দরবন অভিমূখে সারাদেশে লংমার্চ।

বক্তারা বলেন, সুন্দরবন অসংখ্য প্রাণের সমাহার। নানা স্থাপনা তৈরী করে এই ম্যানগ্রোভকে নষ্ট করা হচ্ছে। সুন্দরবনের ভেতরে বারবার তেল, কয়লা, সিমেন্ট বোঝাই জাহাজ বারবার ডুবি সত্ত্বেও এর প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এলাকায় ভূমি ও বনগ্রাসী বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর ওরিয়নকে এবং আরও ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে। কনভেনশনে বক্তারা সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে সুন্দরবন বিনাশী সব ধরনের তৎপরতা বন্ধের দাবি জানান। ❑

মরক্কোর খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী ফাতিমা মারনিসির জীবনাবসান

চলে গেলেন মরক্কোর জনপ্রিয় নারাবাদী লেখিকা ও সমাজবিজ্ঞানী ফাতিমা মারনিসি। গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণকারী ফাতিমা মারনিসি প্রচলিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আধুনিক নারীবাদী মতবাদের যোগসূত্র অনুসন্ধানধর্মী লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যজগতে নিজের আসন সুদৃঢ় করেন। তিনি 'বিয়ন্ড দ্য ভেইল', 'দ্য ভেইল অ্যান্ড মেইল এলিট', 'ইসলাম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি'সহ অসংখ্য ক্ল্যাসিকের রচয়িতা। নারী অধিকার আন্দোলনকর্মী ফাতিমা তাঁর ইসলাম ও নারী বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী কাজের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৪৭ সালে ব্র্যান্ডিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি তাঁর জন্মভূমি মরক্কোতে ফিরে আসেন এবং রাবাতের মোহাম্মদ (পঞ্চম) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।

তাঁর সমাজ সচেতনতামূলক কাজ এবং মুসলিম নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সব সময়ই মরক্কোর সমাজে নারী ও শ্রমকেন্দ্রিক চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করে গেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারী বিষয়ক প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে তিনি একে ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে সম্পূর্ণ নতুনরূপে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ, যার ভিত্তি হবে নারী ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রচলিত ধ্যানধারণার পরিবর্তে সঠিক এবং সর্বজনের নিকট সবচেয়ে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর লেখা সবচেয়ে আলোচিত 'বিয়ন্ড দ্য ভেইল: মেইল-ফিমেইল ডাইনামিকস ইন মডার্ন মুসলিম সোসাইটি' (১৯৭৫) বইটিতে তিনি হাদিসসহ নানা ধর্মীয় বিধিবিধান পর্যালোচনা করেছেন এবং নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এগুলোর বিশ্লেষণ করে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রচলিত 'নিশ্চুপ, নিষ্ক্রিয়, বাধ্যগত' নারী চরিত্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃত ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মারনিসি তাঁর কাজের মাধ্যমে ইসলামের লিঙ্গবৈষম্যগত ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক মুসলিম জীবনাচরণের ওপর আলোকপাত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, নারীর অবাধ স্বাধীনতা পুরুষশাসিত সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত অ্যারাবিয়ান বিজনেস ম্যাগাজিনের ১০০ জন প্রভাবশালী আরব নারীর তালিকায় মারনিসি ১৫তম নারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ইউনেস্কো, আইএলও, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণাধর্মী কাজেও যুক্ত ছিলেন। লেখালেখির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তাঁর কাছে এটি ছিল আধুনিক সমাজের একান্ত অনুষঙ্গ। ফাতিমা বলতেন, "লেখালেখি এমন একটি আসক্তি, যা হানাহানির সম্পূর্ণ বিপরীত। কোরআন শিক্ষার স্কুলে গিয়ে আমি এটি বুঝতে পেরেছি। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে কোরআন ও বাইবেল কেন বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রীত হয়ে আসছে? এর উত্তর খুবই সহজ। কেননা এই দুটি বইতে অনুসারীদের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, হানাহানি কিংবা ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে একে অন্যের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ডাক দেওয়া হয়নি।" তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে লেখালেখি ও গবেষণাধর্মী কাজ করে গেছেন।

মূল সংবাদ: moroccoworldnews.com/2015/11/173892/ moroccos-sociologist-fatima-mernissi-dies-at-75/> ❑

বিআইডিএসের দুটি গবেষণা

১.বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার এবং প্রবৃদ্ধি

সম্প্রতি বিআইডিএসের গবেষক ড. বিনায়ক সেন বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর করা একটি গবেষণার ফলাফল প্রচারমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করেন। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১০ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ ছিল ২০ শতাংশ। গবেষণার উপস্থাপনে আরো বলা হয় যে, তাঁরা মধ্যবিত্তের যে সংজ্ঞা ধরেছেন, সে অনুযায়ী বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ দেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালে এই অনুপাত হবে মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ। তাঁরা মধ্যবিত্তের যে মানদণ্ড ধরেছেন তা হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন ২০০৫ সালের পিপিপি ডলার হিসাবে ২-৩ পিপিপি ডলার আয় করলে তাকে মধ্যবিত্ত বলে ধরা হবে। তাঁরা এই মানদণ্ড ব্যবহার করে মধ্যবিত্তের অনুপাত বের করেছেন হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভের (খানার আয়-ব্যয় জরিপ) ডাটার ভিত্তিতে। ড. সেন তাঁর গবেষণার উপস্থাপনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞায়ন নিয়ে যে কোনো ঐকমত্য আজ পর্যন্ত হয়নি সেটা তুলে ধরেছেন এবং বিভিন্ন গবেষক যেসব ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞায়ন করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সেগুলোও তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি তাঁর উপস্থাপনে বলেছেন যে বাংলাদেশের পরিস্থিতির আলোকে এখানকার উন্নয়নের মাত্রাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় রেখেই এই মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর এই মধ্যবিত্তের মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েই যায়। কারণ ২০০৫ সালের পিপিপি ডলার হিসাবে ১ পিপিপি ডলার সমান বাংলাদেশি ২২.৬৪ টাকা হওয়ার কথা[১]। সেই হিসাবে দৈনিক ২-৩ পিপিপি ডলার আয় করার মানে হলো দৈনিক ৪৫.২৮ থেকে ৬৭.৯২ টাকা আয় করা।

সেই হিসাবে কেউ যদি মাসের ৩০ দিনই কাজ করে (যেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম) তাহলে তার মাসিক আয় হতে হবে ১৩৫৯ থেকে ২০৩৮ টাকা। এখন এই হিসাবে যদি কোনো পরিবারে ৫ জন সদস্য থাকে এবং ৫ জনই আয় করে (যেটা হওয়ার সম্ভাবনাও সাধারণত খুব কম) তাহলে এই গবেষণার মানদণ্ডের আলোকে ২০০৫ সালের হিসাবে পরিবারটির সম্মিলিত মাসিক আয় হবে ৬৭৯২ থেকে ১০১৮৮ টাকা। এখন এটিকে যদি ২০১০ সালের মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা হয় তাহলে ২০১০ সালে এই মানদণ্ড অনুসারে পরিবারটির মাসিক আয় ছিল ৯৫৮৯ থেকে ১৪৩৮৪ টাকা। খুব সংগত কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে, ২০১০ সালের পরিস্থিতিতে এটি কী করে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক আয় হয়? তাছাড়া একটি পরিবারে ৫ জন সদস্য থাকলে ৫ জনই যে আয় করবে তেমনটি তো সাধারণত হয় না। যদি পরিবারটিতে ২-৩ জনও আয় করে তাহলে এই গবেষণার মানদণ্ড অনুসারে 'মধ্যবিত্ত' এই পরিবারটির মাসিক আয় আরো নেমে যাবে। অবশ্য এখন পর্যন্ত ড. সেনের মূল গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়নি এবং এখানে কেবল তাঁর গবেষণার পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের ওপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নগুলো রাখা হয়েছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলে এখানে উপস্থাপনজনিত কোনো ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে কি না সেটা বোঝা যাবে।

তথ্যসূত্র:

১.http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP.05?page=2 ❑

২.বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকের মজুরি এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন

এই গবেষণাটি করেছেন বিআইডিএসের গবেষক নাজনীন আহমেদ এবং দিল্লির ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের গবেষক দেব নাথান। এই গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা বলতে চেয়েছেন, বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাতের প্রবৃদ্ধি এ খাতের জন্য অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ও সামাজিক মানোন্নয়ন দুটোকেই এনে দিতে পারে। তাঁরা আরো বলতে চেয়েছেন যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি ও তার উন্নতির জন্য শ্রমিকদের সংগঠন ও সংগ্রামের একটি ভূমিকা রয়েছে। গার্মেন্টসের মালিক, শ্রমিক, সরকার এবং আন্তর্জাতিক বায়ারদের জোটগুলোর মধ্যকার আন্তসম্পর্ক শ্রমিকের কণ্ঠ তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে গার্মেন্টসের মালিক অর্থাৎ সরাবরাহকারী এবং ক্রেতার মধ্যকার সম্পর্ক এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এ দুই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে ত্রিপক্ষীয় শিল্প সম্পর্ক কাঠামোর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। তাঁদের গবেষণার পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনে আরো যেসব তথ্য উঠে আসে তা হলো : বাংলাদেশের গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানির প্রতি এককের মূল্য ১৯৯০-২০০৯ সালের মধ্যে ১৬.৮৬ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি খুব বেশি না হলেও তা গার্মেন্টস পণ্য উৎপাদনকারী বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর চেয়ে বেশি। গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বিগত বছরগুলোতে আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এই খাতের নিম্নতম মজুরি এখনো পরিবার নিয়ে বাঁচার যোগ্য নয়। আইএলওর ডিসেন্ট ওয়ার্ক বা শোভন কাজের মানদণ্ড এখনো এ খাত অর্জন করতে পারেনি। গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি বাড়লে মালিক প্রতিযোগিতায় মার খাবে বলে যে প্রচলিত ধারণা আমাদের দেশের মালিকদের মধ্যে আছে, তার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে গবেষকদ্বয় দাবি করেন যে, এই মজুরি বৃদ্ধি মালিকের প্রতিযোগিতার সক্ষমতায় তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি প্রতিযোগী দেশগুলোর গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরি থেকে কম। ❑

তাজরীন হত্যাকাণ্ডের ৩ বছর

শহীদুল ইসলাম সবুজ

২৪ নভেম্বর ২০১৫ আশুলিয়ার তাজরীন গার্মেন্টসে দেড় শতাধিক শ্রমিক পুড়িয়ে হত্যার তিন বছর পূর্ণ হলো। তাজরীনের মালিক দেলোয়ার হোসেনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয়েছিল তখন। সরকারি বিভিন্ন সংস্থাসহ চারটি তদন্ত কমিটির সব ক'টিই শ্রমিক হত্যার জন্য গার্মেন্টস মালিক দেলোয়ার হোসেনসহ সংশ্লিষ্টদের অভিযুক্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে। আশুলিয়া থানার পুলিশ বাদী হয়ে যে মামলাটি দায়ের করে, তার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন তিনজন। আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডির সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এবং সিআইডি পুলিশের পরিদর্শকের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি ২০১৩ সালের ২ ডিসেম্বর ৩২৩/৩২৫/৪৩৬/৩০৪/৩০৪-ক/৪২৭ দ.বিধিতে সিএমএম কোর্টে অভিযোগপত্র দাখিল করে। সাক্ষী করা হয় ১০৪ জনকে। নানা দীর্ঘসূত্রতার পর ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সেই অভিযোগপত্র গৃহীত হয় কোর্টে। শুরু হয় বিচারকাজ। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর পর পর দুটি তারিখের একটিতেও সাক্ষী হাজির করেনি পুলিশ। এই মামলাটির পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ জানুয়ারি ২০১৬। ১ নভেম্বর কোর্টের নির্ধারিত সময়ের পর আমরা সরকারি আইন কর্মকর্তা (পিপি) সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সাক্ষী হাজির না করার কারণ। তিনি বলেছেন, সাক্ষী হাজির না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি সাক্ষী হাজির হবে, বলেছেন তিনি।

এছাড়াও একজন নিখোঁজ শ্রমিক রেহেনার ভাই আশুলিয়া থানায় বেশ কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পরও মামলা না নেওয়ায় সিএমএম কোর্টে একটি মামলা করেছিলেন, বোনের হত্যার বিচার চেয়ে। আশুলিয়ার পুলিশ সেই মামলাটি বাতিল করে দিতে চেয়েছিল, তারা (পুলিশ) একই ধারায় মামলা করেছে বলে! কিন্তু রেহেনার ভাই কোর্টে নারাজি পিটিশন দিলে মহামান্য কোর্ট মামলাটি পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন সিআইডি পুলিশের তৎকালীন সহকারী পুলিশ সুপার মুনসুর আলী মণ্ডলকে। কোর্ট থেকে সেই আদেশ স্মারক নং ২৬১২-২৩/০৩/১৫-এ পাঠানো হয় সিআইডি অফিসে। যার এমসিসি নং ২৪৮/১৫। কোর্টের নথিতে দেখা যায়, ২৪/০৩/১৫ তারিখে পুলিশের কনস্টেবল-৮৮৯ মো. বাবলু সেই কোর্ট আদেশ সিআইডি অফিসে পৌছান। কিন্তু গত ৯ মাসেও সিআইডি পুলিশ কোর্টে কোনো তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়নি। এমনকি সিআইডি অফিসে খোঁজ নিলে তারা জানায়, মামলাটি পুনরায় তদন্তের কোনো কোর্ট আদেশ তারা পায়নি। প্রতি মাসেই তারিখ পড়ছে আর বাদী মতিন কোর্টে হাজির হচ্ছেন। গত ২ ডিসেম্বর নির্ধারিত তারিখেও মামলাটির পুনঃ তদন্ত রিপোর্ট কোর্টে জমা দেয়নি সিআইডি পুলিশ। মামলাটির পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১২ জানুয়ারি ২০১৬। কিন্তু ১২ জানুয়ারি পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে, বিচার হবে, সেই নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের অবহেলা আর গাফিলতির কারণে শত শ্রমিক হত্যার এই বিচার বানচাল হতে পারে বলে আমরা শঙ্কিত। হয়তো জনতার আদালতই হবে শেষ ভরসা। ❑